নগর-পরিবেশ ঃ কলকাতা এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সময়

বিকাশ এস. জয়নাবাদ

(১) ঈশ্বরের আগমন

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় প্রথম এসেছিলেন ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে, ছোট্ট এক শিশু মায়ের কোল ছেড়ে গ্রামের খোলামেলা পরিবেশ ছেড়ে এক বদ্ধ জায়গায় এসে প্রথমে কেমন ছিলেন, থাকতে পারেন তা অনুমান করলেই কষ্ট হয়। খোলামেলা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দমবদ্ধ পরিবেশের খাপ খাইয়ে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কলকাতায় তাঁর প্রথম বাসস্থান বড়বাজারের ১৩ নং দয়েহাটা স্ট্রিটে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ি। এখন সেই রাস্তার নাম দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড। বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত ঃ ১৮৯১) এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন, " ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে আমি কলকাতায় আনীত হইলাম।" এরপরের তিন মাস, " অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ" তিনি জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ির কাছের এক পাঠশালা, "শিবচরণ মল্লিক নামে এক সুবর্ণবণিক" এর বাড়ির পাঠশালায় পঠন পাঠন শুরু করেন। মাত্র তিনমাস তিনি স্বরূপচন্দ্র দাসের কাছে পড়লেও তাঁকে তিনি ভোলেন নি বলেই বিদ্যাসাগর চরিতে লিখেছেন, "পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।"

এক খোলামেলা পরিবেশ থেকে কলকাতায় চলে আসা শিশুর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল জীবন। যদিও তিনি সৌভাগ্যক্রমে আশ্রয়দাতার বিধবা বোন রাইমণির স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিলেন অফুরান। কিন্তু কলকাতা তখন বিভক্ত ছিল "হোয়াইট ও ব্ল্যাক টাউনে"। ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আসার প্রায় ৩৯ বছর আগে, ১৭৮৯ সালে, ফরাসি পর্যটক গ্রাঁপে কলকাতার চিৎপুর রোডের টিরেটা বাজারে থাকতে শুরু করেন। তিনি যা লিখেছেন তা ছিল ভয়াবহ। অপরিচ্ছন্ন, নোংরা পরিবেশ। কাঁচা রাস্তা। দুটো বাড়ির মধ্যবর্তী অংশে কাঁচা নালা এবং তাতে আবর্জনার স্তূপ। প্রায় তিন দশকেও কোন পরিবর্তন হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া বণিকদের কলকাতা শহরের উন্নতির কোন প্রচেষ্টা প্রায় ছিলই না নয়, তারা তখনও জানতেন না তারা কতদিন ভারতের শাসক থাকবেন, তাই যে পরিকল্পনাই তারা নিক না কেন তা ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং স্বল্পমেয়াদী। যদিও বিদেশী বণিকেরা কলকাতাকে দ্বিতীয় লন্ডন বানাতে চেয়েছিলেন। তাদের সেই গালগপ্পো আজও ব্যঙ্গ করে কলকাতাকে। তারাই নিজেদের বাঁচাতে মারাঠা খাল খনন করেছিলেন জলাজংল্য কলকাতার ভূখন্ডে। মশার আঁতুড় ঘর ছিল বদ্ধ জলায় আটকে থাকা কলকাতা। বর্ষাকালে তা হয়ে উঠত ভয়ংকর। নোংরা, পূতিগন্ধ ময়।

১৮০০ সালে কলকাতা শহরের প্রতি বাড়ির উপর কর ধার্য করার সুপারিশ করা হয়। সেই আদায়কৃত টাকা দিয়ে শহরের আবর্জনা পরিষ্কারের প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু যত্রতত্র কাঁচা নালা, খাটা পায়খানা, ছোট ছোট ডোবা, রাস্তাহীন শহরের অবস্থা ছিল নরকযন্ত্রণার সামিল। এই সময়ই সার্কুলার রোড পাকা করা হয়। গর্ভনর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি প্রথম দূষিত শহরকে দূষণ মুক্তি দিতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে শহরবাসীকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। তাঁর সেই অনুসন্ধান প্রকাশিত হয় ১৬ জুন ১৮০৩ সালে। সেদিন ও কলকাতার কালো মানুষের বসবাসের অঞ্চলে নাগরিক পরিচ্ছন্নতা প্রায় কিছুই ছিল না। এমনকি বাংলা ১২৩৫ সনের কার্তিক মাসের শেষের দিকে বিদ্যাসাগর যখন কলকাতায় আসেন তখনও নয়। অনাদরে অবজ্ঞা তুচ্ছতাচ্ছিল্যে বৃদ্ধি পাওয়া কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র এসে বড়বাজারে উঠেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় যখন এসেছিলেন সেইসময় "বড়বাজার ও সুতানুটির আদি প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী ব্যবসায়ী শেঠ বসাক মল্লিক শীল বড়াল প্রভৃতি পরিবারের আধিপত্য তখনও অক্ষুন্ন ছিল এ-অঞ্চলে। তন্তুবণিক গন্ধবণিক তাম্বুলিবণিক সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি বাঙালী বণিক সম্প্রদায় তখনও কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে

বাণিজ্যক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করতেন। স্থাপত্যকলার স্পর্শশূন্য স্তূপাকার পোড়া-ইটের বিসদৃশ ইমারতশ্রেণীও তখন বড়বাজারকে কুৎসিত করে তোলেনি। বাঙালী শেঠ বসাক মল্লিকদের বিশাল বিশাল চৌহদ্দি জোড়া তিন চার - মহলা সব বাড়ি ছিল বড়বাজারে। পূজামন্ডপ ও দালান ছিল, বাগান পুকুর সবই ছিল। গঙ্গাতীরের ঘাট পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের তৈরি সব পথ ছিল, স্নানের ঘাটও ছিল। অন্তঃপুরের মহিলারা ঝালরঢাকা পাল্কিতে চড়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। পাল্কি-বেহারা ঘাটে নেমে, তাঁদের চুবিয়ে নিয়ে ফিরে আসত। তখন বড়বাজার অঞ্চলে বাঁশবন ও বাঁশঝাড় ছিল অনেক বাঁশতলাভিমুখী গলির অন্ত ছিল না।" (সূত্রঃ বিনয় ঘোষ — বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা - ৫৪) ছোট্ট ঈশ্বরচন্দ্রকে ঠাকুরদাস টাঁকশালের ঘাটে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন কিন্তু অনেক দিন গঙ্গা স্নান না করেই ঘরে ফিরতেন।

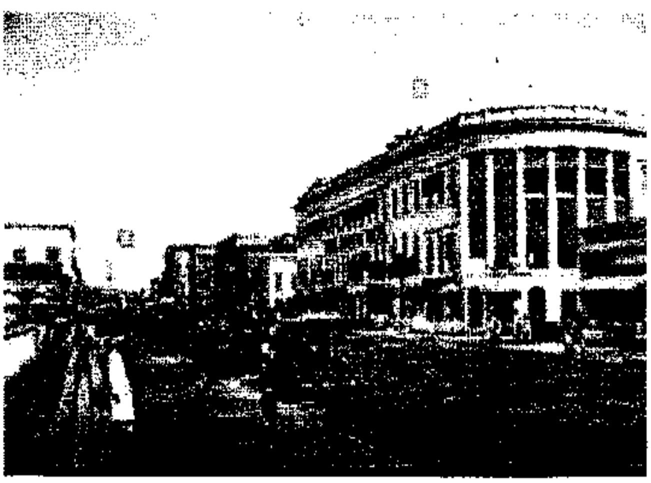

স্থানীয় মানুষ ডোবার জল পান করতে বাধ্য হতেন। যাদের একটু সামর্থ্য ছিল তাঁরা পাতকুয়োর জল পান করতেন। কলকাতা আসার তিনমাস পরেই ঈশ্বরচন্দ্র "রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত" হলেন। স্থানীয় ডাক্তার দেখানোর পরেও রোগ না সারলে ফিরে যান তাঁর দেশের বাড়িতে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রের ছয় সাত বছরের বড়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাঁচরাপাড়ার বাড়ি থেজে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁর মামাবাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন। জোড়াসাঁকো আর দয়েহাটা বলতে গেলে পাশাপাশি অঞ্চল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিখ্যাত ছড়া —

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়ায়ে কলকেতায় আছি।

সেই সময় কলকাতা জুড়ে মশার সাম্রাজ্য। কেন এত মশা সে সম্পর্কে "বেঙ্গল হরকরা" লিখেছে, "বদ্ধ পুষ্করিণীই হল ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উৎস। কলকাতায় তার অভাব নেই। তার জন্য মারাঠা খাল ছাড়িয়ে যাওয়ার দরকার নেই। কলকাতার মধ্যেই এদেশীয় লোকের বসতি খুব বেশি, সেখানে বদ্ধ ডোবা পুকুরের প্রাচুর্য দেখলে বিস্মিত হবেন। ঝোপঝাড় - জঙ্গলেরও অভাব নেই কলকাতায়।" এখানে বলে রাখা ভাল বর্গি আক্রমণের সময় কলকাতায় এই খাল কাটা হয়। পরবর্তী সময়ে সেই খাল বুজিয়ে রাস্তা বানানো হয়। দিনে মাছির উপদ্রব। খাদ্যে বিষক্রিয়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। অসুস্থ শিশুকে সেবা করতে দৌড়ে আসেন তাঁর ঠাকুমা দুর্গা দেবী। স্থানীয় কবিরাজের ওষুধে রোগ কমার কোন লক্ষণ না হওয়ায় তাঁকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়িতে গিয়ে বিনা চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি লিখেছেন, "বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই আমি রোগামুক্ত হইলাম।" (সূত্রঃ বিনয় ঘোষ - বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা -৬১) এই একই অবস্থা হয়েছিল কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের। তিনি পড়াশুনা করতে কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলে এসেছিলেন এবং যথারীতি অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন। কলকাতা ছেড়ে যখন নৌকাতে উঠছেন তখনই তিনি সুস্থ হতে শুরু করেন, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনচরিতে, "একালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় ছিল না। বিশেষতঃ, দেশীয় নাগরিকদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থ্যজনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের (ঠনঠনিয়া অঞ্চল) প্রায় সমস্ত বর্ষে পার্শ্বস্থ প্রণালীর মলযুক্ত হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প উত্থিত হইত। অভ্যাসবশতঃ অধিবাসীদের তাহাতে বিশেষ কষ্ট বোধ হইত না, কিন্তু বাহিরের লোকের এ সকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইত। ....জাহ্নবীতীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহুলোক মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। আমি কলিকাতায় যাইয়া অবধি পুষ্করিণীতে স্নান করিতাম। জলও এতাদৃশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল যে তাহাতে গঙ্গার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও, তাহাতে প্রফুল্ল চিত্তে অবগাহন করা যাইত না। আমি কলিকাতা যাইয়া অবধি পুষ্করিণীতে স্নান করিতাম। একদা কোন যোগে আত্মীয়গণের সহিত জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে গিয়েছিলেম; কিন্তু জলের অবস্থা দেখিয়া আমার স্নান করিতে কোনরূপেই প্রবৃত্তি হইল না। সেদিন আমাকে অস্নাত থাকিতে হইল।"

ব্রিটিশ বণিকদের অপকর্মের ফলে বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জীবনজীবিকা হারিয়ে দিশেহারা, কৃষি ছিল বাংলার ভিত্তি কিন্তু কৃষকদের অবস্থা সঙ্গিন, এমন অবস্থায় কলকাতায় রুটিরুজির অন্বেষণে আসা মানুষজন কীটের বসবাসের অযোগ্য পরিবেশে থাকতে বাধ্য হত। লোকে জানত কলকাতায় কিছুদিন থাকলেই "অজীর্ণ রোগ" বা "লোনালাগা" হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবুও নিরুপায় হয়ে যারা থাকতেন তারা এইসব রোগ সাথে নিয়েই বেঁচে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন, "যাঁহারা তথায় (কলকাতায়) থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোণা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন।"

১৮২৮-২৯ সালে কলকাতায় বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুব্যবস্থা নেই, "মা গঙ্গার জল" বিষ্ঠাপূর্ণ / দূষিত, সন্ধ্যে নামতেই মাটির নীচ থেকে বিষাক্ত পরিবেশকে আরও দূষিত করে তুলত, সাথে মশা এবং মাছির উপদ্রব, সেইসময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র দয়েহাটায় এসেছিলেন। সেখানে এক ঘরে থেকে নিজেই নিজের পড়াশুনা করতেন একমাত্র অভিভাবক দিনের বেলায় ঘরে থাকতেন না তার পেশাগত কারনেই। তবে এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় আশ্রয়দাতাদের উদারতা এবং স্নেহের বন্ধন বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে রক্ষা করেছিল। 'দয়া', 'মায়া' তখনও সমাজ থেকে নগরসভ্যতার কঠোরতর সংঘাতে কর্পূরের মতো উড়ে যায় নি।

(২) ঈশ্বরের রান্নাঘর

ছোটোবেলায়, কলকাতা থাকার সময়ে, ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই রান্না করতেন। সকলে মিলে খেতেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখছেন, "ঐ সময় (১৮৩৪-৩৫) হইতে অগ্রজকে দুই বেলা সকলের পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। কোন দাসদাসী ছিল না। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া বড়বাজার টাঁকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আসিবার সময় বড়বাজার কাশীনাথবাবুর বাজারে যাইতেন। তথায় বাটা মৎস্য ও আলু পটল তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পৌঁছিয়া প্রথমতঃ হরিদ্রাদি ঝাল মশলা বাটিয়া উনন ধরাইয়া মুগের দাউল পাক করিয়া মৎস্যের ঝোল রন্ধন করিতেন। তখন বাসায় চারিজন লোক ভোজন করিতেন, ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিতে হইত। হাঁড়ী মাজিয়া, বাসন ধৌত করিয়া ও স্থান মুক্ত করায় অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নখগুলি ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য হস্তে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত" (সূত্র শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঃ বিদ্যাসাগর জীবন চরিত - কলকাতা ১৮৯১, পৃষ্ঠা ৩১/ঋণ - ইন্দ্রমিত্র ঃ করুণসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ, দশম মুদ্রণ মে ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯৪ / বাংলা বানান অপরিবর্তিত।)

কলকাতায় বাবা আর ছেলে, ঠাকুরদাস এবং ঈশ্বরচন্দ্র, যখন বড়বাজারে থাকতেন তখন তাদের রান্নাঘর কেমন ছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় ইন্দ্রমিত্রের করুণাসাগর বিদ্যাসাগর বইয়ে (পৃষ্ঠা, ৮৯)।

"রান্নাঘরটা অন্ধকার। একফোঁটা রোদ পড়ে না সেখানে। তার উপরে রান্নাঘরের পাশে একটা নরককুন্ড। মলমূত্র আর কৃমিকীটে ভর্তি।

দুর্গন্ধ তো আছেই, তার চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার আছে একটা। খাবার সময় ঈশ্বরকে ঘটি জল নিয়ে বসতে হয়। তা না হলে ভাত খাবার উপায় নেই। দলে দলে কৃমি ঈশ্বরের থালার দিকে এগিয়ে আসে। ঘটি থেকে জল ঢেলে ঈশ্বর কৃমি দলকে ভাসিয়ে দেয়, সরিয়ে দেয়।

রান্নাঘরে আরশোলার ভারি উৎপাত।

একদিন খেতে বসে ঈশ্বর দেখল, তরকারির মধ্যে একটা আরশোলা। না, ঈশ্বর সেকথা তখন কাউকে বলেনি। যদি বলত, নিশ্চয়ই আর - সকলের খাওয়া ভন্ডুল হয়ে যেত। কিম্বা, যদি আরশোলাকে পাতের পাশে ফেলে দিত, নির্ঘাত কারো চোখে পড়ত। ফল একই হত, আর - সকলের খাওয়া পন্ড হত। আর কারো যাতে কিছুই টের না পায়, এমনকি ভাবে ঈশ্বর তরকারির সঙ্গে আরশোলাটাকেও খেয়ে ফেলল। (সূত্র ঃ চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ পৃ. ৫৭)

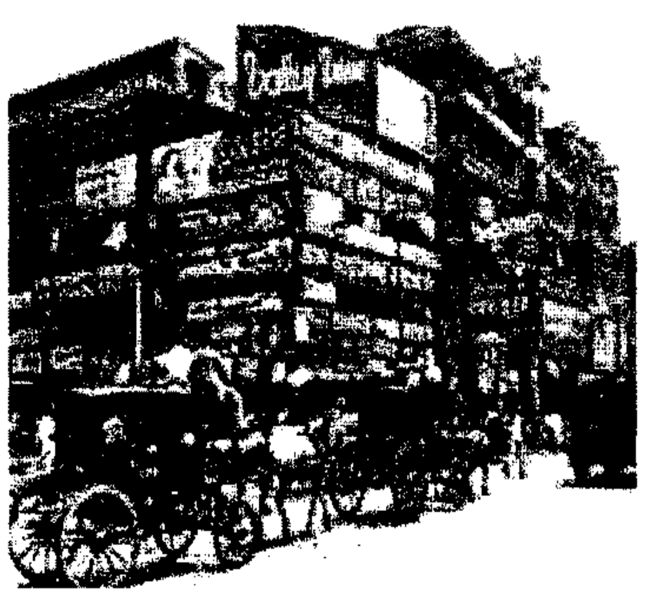

একবিংশ শতকেও অধিকাংশ রান্নাঘরে আরশোলার দেখা মিললেও কৃমির উপদ্রপ তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের কৈশোর সময়ে কলেরা এক ভয়ংকর রোগ হিসাবে সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি তিন সহোদর ও তাহাদিগের জনক ঠাকুরদাস যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীতে বিসূচিকা (কলেরা) রোগ অতি প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইল। প্রত্যহ অনেক ব্যক্তি যমসদনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ পীড়াকে মারাত্মক এখনকার প্লেগ রোগের ন্যায় (বাংলা ১৩২৬ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে। ইংরেজী সাল ১৯১৯-২০ সালে বাংলায় প্লেগ মহামারী আকার ধারণ করেছিল) বিশেষ সংস্পর্শাক্রান্ত রোগ মনে করিত। এখনও যে মনে করে না তাহা নহে।

ঠাকুদাসের আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের কোন পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কহিল আপনার পরিচিত অমুক সপরিবারের ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সে অত্যন্ত দরিদ্র। কেহ তাহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইবে এমন উপায় দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্র তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি শুনিয়া কাহাকেও কিছু কহিলেন না। আন্তরিক বড়ই ব্যথা পাইলেন। সন্ধ্যার পরেই পাক সমাধা করিয়া দীনবন্ধু ও শম্ভুকে আহার করাইয়া পিতার ভোজনের আয়োজন করিয়া সেই পীড়িত ব্যক্তি বর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারা পাঁচ জনেই শয্যাশায়ী হইয়াছে। জল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর।মধ্যে মধ্যে তাহারা বমি ও মলত্যাগ করিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক গৃহস্থের বাটী হইতে এক কলসী জল আনিলেন এবং চক্ মকী ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি সকলকে জল পান করাইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা হরচন্দ্র ওলাওঠা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।..." (সূত্র ঃ লালমোহন বিদ্যানিধি - 'সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক পৌষ, ১৩২৬, পৃ. ১৬৬-৬৯। ঋণ ঃ - ইন্দ্রমিত্র ঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ, দশম মুদ্রণ মে ২০১৯, পৃষ্ঠা ১০২ / বাংলা বানান অপরিবর্তিত)

(৩) জলের কথা কলের কথা

(শহরে) সুখ বলতে একটি আছে
হাত বাড়ালেই জলটি আছে
(বহুবাজার জেলিয়াপাড়াবাসী এক কবিয়ালের গান থেকে উনিশ শতকের শেষের দশক)

জলই জীবন সেদিনও মানুষের ভানার মধ্যেই ছিল কিন্তু ইংরেজদের দ্বিতীয় রাজধানী কলকাতাতে তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ছোটবেলায় কলের জলের সুখ উপভোগ করতে পারেন নি। বাংলার অন্যান্য শহরের (তখন শহর বলতে ঢাকা - চট্টগ্রাম - কৃষ্ণনগর এরকম দুচারটে স্থান) তুলনায় কলকাতায় জনস্ফীতি ছিল বেশি। ইংরেজরা উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত জানতেন না ভারতে তাদের অবস্থান কি হবে। তখনও তারা মুঘল সাম্রাজ্যের কর আদায়কারী প্রতিনিধি মাত্র। তারা যেখানে ইউরোপীয় মানুষেরা বসবাস করতেন, কলকাতার ওয়াইট টাউনের, সেখানের নাগরিক পরিষেবা প্রদানে আগ্রহী ছিলেন। আর সেইসময়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজরা তাদের নিজেদের ব্যবসার প্রয়োজনে যতটুকু করার ততটুকুই করতেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকেই কলকাতায় জনস্ফীতি বৃদ্ধির সাথে সাথে পানীয় জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পয়ঃপ্রণালী দূষিত হতে থাকে। সেইসময় কলকাতায় রাস্তা বলতে যা ছিল তা কাঁচা বর্ষায় যাতায়াতের অযোগ্য। কলকাতায় লটারির মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে সেই টাকা জনগণের নাগরিক পরিষেবা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে।

নাগরিক পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি এবং যোগানের অপ্রতুলতা কলকাতার মানুষকে নরকে বসবাসের অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। জুয়া খেলে উপার্জিত টাকায় কলকাতায় নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার অর্থ মাছের তেলে মাছ ভাজার আনন্দ উপভোগ করা। এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লটারি হয় কলকাতাকে বাসযোগ্য করবার জন্য। যারা বলতেন কলকাতা লন্ডন হবে তারা কল্পনাবিলাসী, চাটুকার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের তিন বছর আগে "২১ অক্টোবর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির কাউন্সিলের সহ-সভাপতি (The Vice President in Council) বিখ্যাত লটারি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির উপর পূর্বের লটারি কমিশনারদের ও ওয়েলেসলি কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই নতুন লটারি গঠনের সময় সরকার কমিটির কর্মপ্রণালী সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন — নতুন পুষ্করিণী খনন, প্রয়োজন মতো পুরনো পুষ্করিণী ভরাটের ব্যবস্থা, নতুন বড় রাস্তা ও গলি নির্মাণ, জল পরিবহনের নালা (aquaduct) স্থাপন, সেতু ও ঘাট নির্মাণ এবং নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য, আরাম ও নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধা প্রদানার্থে অন্যান্য কার্য। এককথায় বলা যেতে পারে এই লটারি কমিটির তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র নতুন উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার হবে।" (সূত্র ঃ অজিত কুমার বসু - কলিকাতার রাজপথ সমাজে ও সংস্কৃতিতে, আনন্দ, পৃ. ৪৮/অন্য সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ - সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খন্ড, সংবাদ প্রভাকর)

কলকাতার মানুষ পুকুরের জলেই নিত্যকর্ম সাধিত করতেন। বর্তমানে এখন কলকাতার যে বিশাল পরিধি সেই অঞ্চলের মধ্যে "সব মিলিয়ে পুকুর বা জলাশয়ের সংখ্যা ছিল তিন হাজার ছয়শো সাতষট্টিটি" (সূত্র ঃ ধনঞ্জয় রায় - পশ্চিমবঙ্গের দিঘি ও জলাশয় পৃ. ১৫৬)। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমলে কলকাতার পরিধি ছিল আরও ছোট। তখন শুধুমাত্র উত্তর কলকাতা নিয়েই ছিল নেটিভ টাউন বা কালো মানুষের শহর। সেইসময় উত্তর কলকাতার মানুষ পুকুরের জলকেই পানীয়জল হিসাবে সংরক্ষণ করতেন। উত্তর কলকাতায় হেদো পুকুরের এক বিখ্যাত পুকুর ১৮২০ সালে নতুন সংস্কার করে চারদিকে গাছ লাগিয়ে নতুন

নামকরণ হয় কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার। এর আট নয় বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আসেন। এই হেদুয়া > হেদো পুকুর নিয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনীতে কিছু কথা, "খাইবার জন্য চাকরেরা হেদুয়া হইতে বাঁকে জল আনিত। তখনকার দিনে হেদুয়ার জল ছিল উৎকৃষ্ট। গঙ্গাজলে পোকা হইত না। হেদুয়া পুকুরের জল কিছুদিন রাখিলেই পোকা হইত, পরে কলের জলও জালায় রাখিলে সরু সরু পোকা হইত।" (সূত্র ঃ কলিকাতার কাহিনি ও প্রথা, পৃ. ৪) কলকাতার প্রাচীন পুকুরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুকুর লালদিঘি। এই দিঘির জল পান করতেন সেইসময়ে কলকাতায় বসবাসকারী সমস্ত ইউরোপীয় মানুষেরা। এই দিঘির কাছেই ছিল পুরাতন ফোর্টে উইলিয়াম সে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লা। লালদিঘির পাশেই ছিল খুব সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বেশ সাজানো গোছানো 'ওয়াইট টাউন' যাকে দেখে ফরাসি পর্যটক গ্রাঁপে (M.L.Granpe, ১৭৮৯ সালে কলকাতায় আসেন) কলকাতা কেবলমাত্র এশিয়ার নয় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও এক সুন্দরতম শহর (সূত্র ঃ Voyage in the Indian Ocean and to Bengal undertaken in 1781-90) এ যেন অন্ধের হস্তি দর্শন। লাল দিঘি নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনীকাব্যে' লিখেছেন —

ভাল জল লাল দিঘি হিম সরোবর
চারি ধারে ফুলবন শোভা মনোহর
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর সোপান
চৌদিকে লোহার রেল শূলের সমান

চারিদিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর
অপরূপ দরশন অতীব সুন্দর।

লালদিঘি কে বানিয়েছেন তা নিয়ে একাধিক মত আছে। অনেক বলেন লালদিঘি খনন করেছিলেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী লালমোহন শেঠ আবার কেউ বলেন লালচাঁদ বসাকের বাস্তু দেবতার মন্দির ছিল বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ভিতরে সেই দেবতার পূজার জল নেওয়ার জন্য লালচাঁদ বসাক পুকুর খনন করেন বলে পুকুরের নাম লালদিঘি। কেউ বলেন শেঠ বসাক-সাবর্ণ চৌধুরীরা এই দিঘিকে অবলম্বন করে নিজেদের আশ্রয় গড়ে তোলেন। সাবর্ণ চৌধুরীদের শ্যাম রায়ের মন্দির লালদিঘির কাছেই। আবার কেউ বলেন লালদিঘি ইংরেজরা খনন করেছিলেন বিশুদ্ধ পানীয় জলের আশায়।

দীনবন্ধু মিত্রর 'সুরধুনীকাব্যে' গোলদিঘির কথা আছে। তখন গোলদিঘি ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে হিসাবে পরিচিত ছিল। গোলদিঘির নাম কেন গোল এই নিয়ে এক জনশ্রুতি একদা এখানে হোগলার জলপূর্ণ বন ছিল, পরে হোগলা উচ্ছেদ করে পুকুরকে রক্ষা করা হয়। এটা একটা গোলাকৃতি পুকুর হিসেবেই খ্যাত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের গোলদিঘির পরিচয় কলকাতায় আসার সমসাময়িক সময় থেকেই। "পিতার সঙ্গে প্রায় ছয়মাস বড়বাজার থেকে গোলদিঘি যাতায়াত করার পর ঈশ্বরচন্দ্র পথঘাট ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে পরিচিত হলেন।" (সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ – বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা ৭০-৭১)

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক ছোট, তিনি কলকাতার পুকুর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "তখন জলের কল ছিল না, প্রত্যেক ভবনে এক একটি কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই চারটি পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি, যখন কলকাতার পত্তন হয় তখন বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। শহর যেমন বাড়িতেছে লোকে ধানের খেতে পুষ্করিণী খনন করিয়া বাস্তুভিটা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়াছে। এই অনুমানের আর একটি প্রমাণ এই যে, পুষ্করিণী সকল শহরের পূর্বাংশেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ সুতানুটী গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রাম সকল নদীর পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল; সেখানে অধিক পুষ্করিণীর প্রয়োজন ছিল না।

এই পুষ্করিণীগুলি জ্বরের উৎসস্বরূপ ছিল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে কয়েকটি দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে দিতেন না ; সেইগুলি লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্ব প্রধান ছিল। উড়িয়া ভারীগণ ঐ জল বহন করিয়া গৃহে গৃহে যোগাইত।"

কলকাতায় পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সরবরাহ শুরু হয় ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে, ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের দু বছর পরে, তাঁর কলকাতায় আসার ছয় বছর আগে। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁর কলের শহর কলকাতা বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "কলকাতায় জাত মারা প্রথম জলের কলের উল্লেখ প্রাচীন মানচিত্রে পাওয়া যায়। ১৮৩৩-এ ডয়েলির আঁকা চাঁদপাল ঘাটের ছবিতেও একটি চিমনি দেখে জলের কলের সন্ধান পাওয়া যায়। বয়লার হাউসে, অর্থাৎ যেখানে কয়লা পুড়িয়ে জল থেকে বাষ্প তৈরি হতো, সেখানে এমন একটি চিমনি থাকতেই হবে। এই জলতোলা বাষ্পের কলটি বসানো হয় ১৮২২-এ। একটি উন্মুক্ত প্রণালী (অ্যাকোয়াডাক্ট) দিয়ে তখন জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। এই কল বসার প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের তোলা ফটোগ্রাফ সাক্ষী, বর্তমান রাজভবনের পশ্চিমে ফুটপাতের কিনারায় সেই প্রণালী থেকে কয়েকজন জল সংগ্রহ করছেন।" গঙ্গা থেকে জল তুলে তা সরবরাহ কে বা কারা করছেন সেটাও দেখবার বিষয়। লটারি কমিটির মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে সেই টাকা জনগণের নাগরিক পরিষেবা প্রদান এক অনৈতিক ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। যারা বলতেন কলকাতা প্রাচ্যের লন্ডন তারা কেউ বলতেন না জনগণের নাগরিক পরিষেবা প্রদান, বিশেষ করে প্রতি নাগরিকের জন্য জলের পরিষেবা প্রদান রাষ্ট্রের অন্যতম কর্ম হওয়া উচিত।

তবে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হলেও প্রতি নাগরিকের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার পরিকাঠামো তৈরি করতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লেগেছে। শহরের অনেকে শহরের নলবাহিত জল সরবরাহে আগ্রহের সাথে এগিয়ে এসেছিলেন। সংবাদ প্রভাকর ঃ বাংলা ৬.১১.১২৫৯ ঃ ইংরেজি ১৩.২.১৮৫৩ ;লিখছে, "আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি, জানবাজার নিবাসিনী সুশীলা পুণ্যশীলা সৎকীর্ত্তিকারিণী শ্রীমতী রাসমণি দাসী সংপ্রতি এক অতি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তচ্ছ্রবণে সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

উক্তা শ্রীমতীর বাটির নিকট হইতে মৌলালির দর্গা পর্য্যন্ত জল প্রণালী না থাকাতে পথিক ও পল্লীস্থ লোকদিগের বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তালতলা নিবাসী সুচিকিৎসক বিচক্ষণ বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কষ্ট দূরীকরণার্থ এক জল প্রণালী নিস্মার্ণ নিমিত্ত চাঁদা অর্থ সংগ্রহ করণে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং ২৫০০ টাকা দানপূর্ব্বক একাকিনী তৎকার্য সম্পন্ন করণে সম্মতা হইয়াছেন। এই দান সাধারণ দান নহে– এবং ; এই কীর্ত্তি সামান্য কীর্ত্তিও নহে, ইহা পৃথ্বী মধ্যে বহুকাল ব্যাপিনী হইয়া জনসমূহের মহোপকার করত কীর্ত্তিকারিণীকে চির-স্মরণীয়া করিবেক।" (সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ – সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খন্ড, ৪২৫-২৬)

যখন কলকাতায় কলের সরবরাহ শুরু হল তখন কলের জল সম্পর্কে কত কথা কুকথা আলোচনা। সেইসময়ে কলকাতার নদীর তীরের কথা বলতে গিয়ে "বিবিধার্থ - সংগ্রহ" (১৮৫৩ সালে) লিখেছে, "গঙ্গা হইতে জল উত্তোলনের এক বাষ্পীয় যন্ত্র স্থাপিত আছে, কিন্তু পাঠকবর্গ কেহই তদ্দ্বারা উত্তোলিত জল ব্যবহার করেন না, ও নগরের হিন্দুপল্লীতে তজ্জলদ্বারা রাজপথ অভিষিক্ত হয় না, সুতরাং উক্ত যন্ত্রের বর্ণনে বিমুখ হইয়া চাঁদপাল ঘাটে প্রস্থান করিলে কেহই বিরক্ত হইবার নয়েন।" (সূত্র ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ – কলের শহর কলকাতা - ৪৩ পৃষ্ঠা) বিশুদ্ধ পানীয় সম্পর্কে ছুৎমার্গ দীর্ঘদিনের। কলকাতা একদিন হয়ে উঠেছিল কলের শহর। উনিশ শতকের শেষে রূপচাঁদ পক্ষী, তাঁর সময়ের 'কলিকাতা বর্ণন' গাইতে গিয়ে বলছেন ;-

পাটের কল আর ময়দার কল, রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল,
জলতোলা কল, খোয়া ভাঙ্গা কল, কলাকৃতি ঐরাবৎ করে এক দিবসে সোজা পথ।
কলের খুরে দন্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রাম নগর। (অংশ)

১৮৭০ সালেও কলের জল, যদিও খুব অল্প মানুষের ঘরে পৌঁছাতো, কলের জল নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল। 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় "উদাসীনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে" কলের জলের কেচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

বাবু ভেবে নল বসায়ে লয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে
(ঘরের দেয়াল ফুঁড়ে উঠেছে) ধন্য 'জনার্দ্দনের বলদ' সকলই পার বুদ্ধির জোরে।
উদাসীন বাবাজী মজালে ভ্রষ্টাচারে,
(ইয়ং বেঙ্গলে আর হামবাগ মিলে) কেবল ধরা পলো ব্রহ্মজ্ঞানী-সত্য কথা প্রকাশ করে।
যাই বলিহারি সভ্যতারে।
এবার জেতের দফা, করলে রফা, দিয়ে সুখ নানা প্রকারে।
কলের গাড়ী জলের কল, দিয়েছে সব
আলগা করে (ও ঘোর কলি বুঝি নিকট হলে)
কেবল গোঁড়া হিন্দু দুই এক জনা রেখেছে টেনে হিঁচড়ে।
এমন সাধু কেবা আছে থাকবে এ
সুবিধা ছেড়ে, (সেকাল নাই আর নাই রে ভাই)
দিলে ব্যবস্থা 'ধর্ম্মরক্ষিণী' খেয়ে দেখে বিচার করে।
মহাজ্ঞানী রাজা বাহাদুর দেখেছেন
শাস্ত্র পড়ে, (আহা মরি রে তোর অগাধ বিদ্যে)
থাকবে হিন্দুস্থানী খেলে পানি শরীরের সুখের তরে।
দুঃখী প্রাণী মজুর মুটে খাচ্ছে সব
সবে প্রাণ ভরে, (একাকার একাকার হইল)
রাজা প্রজা উঁচু নীচু দিলে জলে সমান করে।

(ঋণ ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ - কলের শহর কলকাতা - ৪৩/৪৪ পৃষ্ঠা)

কলকাতা শহরে এক সময়ে রাস্তা ছিল না বললেই চলে। কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে। লটারি কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন পথ নির্মিত হতে থাকে। রাস্তা যানবাহনের উপযোগী করা হয়। রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে প্রতিদিন জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হত। রাত্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য পথ বাতির সূচনা করা হয়।

১৮৫০ এর দশকে কলকাতায় সাধারণ মানুষের রুটিরুজি জোগানের শহর হয়ে ওঠে। সংবাদ প্রভাকরের বাংলা ১৭.০১.১২৫৭ তারিখের সংবাদ অনুসারে ১৮৫০ সালে কলকাতার জনসংখ্যা / প্রজার সংখ্যা ছিল ৩৬১৩৬৯ জন, বাড়ির সংখ্যা ছিল —

"একতলা বাটী	৫৯৫০
দোতলা বাটী	৬৪৩৯
তেতলা বাটী	৭২১
চৌতলা বাটী	১০
খড়ুয়া ঘর	৪৮৪৪৫
ভূমি	১৫১৪৪ বিঘা।

১৭৯৪ সালে আপজন সাহেবের সম্পাদিত কলকাতার জরিপ থেকে জানা যায় শহরের বিস্তৃতি ছিল ৪৯৯৭ একর, পাকা বাড়ি ছিল ১১১৪টি আর কাঁচা বাড়ি ছিল ১৩,৬৫৭টি। (সূত্র ঃ কলিকাতার রাজপথ, পৃষ্ঠা ৩৯)

'সংবাদ প্রভাকর', ২৫ ভাদ্র, ১২৬১ ইংরেজ সেপ্টেম্বর১৮৫৪, পরিচ্ছন্ন কলিকাতা সম্পাদকীয়তে লিখছে, "রাস্তা বাঁধানো, পয়ঃনালা খনন, পুল নির্ম্মাণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলিগলির বৃদ্ধি করা, রাজপথে জলসেচন, আলোক প্রদান ইত্যাদি কাজ করিবার কাজ হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী পাড়ার প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা। সেইদিকে কমিশনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।"

১৮২৮ সালের কলকাতা তুলনামূলক ভাবে ১৮৫৭ সালের পরবর্তী সময়ে অনেক পাল্টে গেছে। কলকাতায় গ্যাসের আলো ঝলমল করতে করতে হাসতে শুরু করেছে। কিন্তু জলবাহিত রোগে মারা গেছেন অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তিও। বিশুদ্ধ পানীয় জলের বড় আকাল ছিল। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। যেখানে সেখানে প্রসব ত্যাগ করলে শাস্তি পেতে হত। ১৮৫০ সালেই যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখণ, ট্রামলাইন বসানোর আগে, পশুচালিত যানের প্রাধান্যই চোখে পড়ার মতো। রাস্তাঘাটে সেই পশুচালিত যানের মলমূত্রে বিভীষিকা তৈরি হত। এছাড়া ছিল প্রকাশ্য রাস্তায় বেশ্যাদের ক্রিয়াকর্ম যা সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করত বলে অনেকেই মনে করতেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে সমগ্র ভারতবর্ষটাই ছোট্ট দ্বীপের অধীনে চলে গেছে। ফলে কলকাতা শহরের গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সালের নভেম্বর মাসে এক আদেশে জানানো হয় এরপর থেকে যত্রতত্র মানুষকে পোড়ানো এবং কবর দেওয়া নিষিদ্ধ। মৃতদেহ ফেলে রাখা যাবে না শুধু তাই নয় যেখানে সেখানে বিশেষ করে খোলা রাস্তা, জলাশয়, পুকুর, নদীনালায় মৃত পশুপাখি ফেললে জরিমানা আদায় করে হবে। এতে নাগরিক পরিবেশের শ্রী বৃদ্ধি হয়। সংবাদ প্রভাকর থেকে জানা যায় "১৮৬১, ৩১ আগস্ট সিটন – কার কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেন যে, কলিকাতার উন্নতির জন্য ২১/২ % জলকর ধার্য করতে হবে" (সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ - সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খন্ড, পৃ. ৫১৭)

একটা নগরের পরিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে যখন পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং পয়ঃপ্রণালী স্বাভাবিক থাকে। মজাটা এখানেই যারা কলকাতার প্রথম পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জল শহরের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন তা বিফলে যায়। কারণ কলকাতার দূষিত জল নিষ্কাশনের যে পরিকল্পনা ছিল তা পরিকল্পনায় গলদ থাকাতে বিধ্বস্ত করেছিল নাগরিকদের। গঙ্গার পূর্বপাড় কলকাতার ভূমিস্তর থেকে উঁচু ছিল। ওয়েলেসলি পরবর্তী সময়ে শহরের জলনিকাশী ঢাল পূর্ব দিকে করার চেষ্টা হয়। সেইসময় থেকে কলকাতায় পয়ঃপ্রণালীর জল গিয়ে মিশত বিদ্যাধরী নদীতে। বিদ্যাধরী বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের জল নিয়ে এসে কলকাতার সমস্ত দূষিত জল টেনে নিয়ে যেত। যখন টালি নালা খনন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল শহরের নোংরা জল খুব সুন্দর ভাবে নিষ্কাশন হবে কিন্তু "টালি নালা হেস্টিংসের মুখ থেকে বিদ্যাধরী নদীর শামুকপোতা পর্যন্ত জলের প্রবাহে স্বচ্ছন্দ গতি পেলেও বিদ্যাধরীনদীর প্রবাহে বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। (সূত্র ঃ চির দত্ত — কলকাতার জলাভূমি ঃ পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, পৃ.৩) ১৮৫০ দশকের পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলার সাথে যোগাযোগের জন্য শিয়ালদহ থেকে রেললাইন বসানোর কাজ শুরু হলে কলকাতার বিস্তৃর্ণ অংশের জল নিকাশী ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতা শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল পূর্ব দক্ষিণে নেমে যেত। এতে মশার বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে।

(৪) পথের কথা

বীরসিংহ গ্রাম থেকে ১৮২৮ সালে হেঁটেই কলকাতায় এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সে গল্প অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। তখন বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা বিকল্প পথ ছিল জলপথ। সমাচার দর্পণ, ৪ জুলাই, ১৮২৯, লিখছে, "কলিকাতা এবং তৎ উত্তরোত্তরাঞ্চল হইতে জলপথে তমলুক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান সকল যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা তেমোয়ানি প্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত।" (বিনয় ঘোষ — বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ.৫১) যাতায়াতের সুবিধার জন্য উলুবেড়িয়া থেকে মহেশডাঙ্গা একটি খাল কাটা হয়েছিল এই কাটা খাল দিয়ে কলকাতায় আসা যেত। কিন্তু কোম্পানি উচ্চহারে কর আদায় করত। স্থলপথেই কলকাতায় এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের গোলদিঘির পরিচয় কলকাতায় আসার সমসাময়িক সময় থেকেই। "পিতার সঙ্গে প্রায় ছয়মাস বড়বাজার থেকে গোলদিঘি যাতায়াত করার পর ঈশ্বরচন্দ্র পথঘাট ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে পরিচিত হলেন।" (সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ — বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা ৭০-৭১) "বড়বাজার থেকে পটলডাঙ্গা, দয়েহাটা থেকে গোলদিঘি" একা এক ছোট্ট ছেলে কি করে যেতেন এখন ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। তখন যানশাসনের ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তাঘাটে নব্যবাবুদের ঘোড়ায় চেপে কলকাতা ভ্রমণের বিলাসিতা, সাহেবসুবোদের বেপরোয়া

যাতায়াত, পাল্কি বাহকদের এবং পথিকদের কাছে ত্রাস ছিল। ঘোড়া কোন কারণে ক্ষেপে গেলে দুর্ঘটনা ঘটত। মানুষ মারা যেত, জখম হত। কিচ্ছু করার ছিল না। পরবর্তী সময়ে কলকাতা রাস্তাঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, চওড়া হলেও দুর্ঘটনা ইতিহাস খুব একটা সুখপ্রদ ছিল না। ১৮৬৬ সালে কলকাতা থেকে অন্য অঞ্চলের স্থলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সেইসময় ঈশ্বরচন্দ্র মেয়েদের শিক্ষা প্রচারে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। উত্তরপাড়ায় সময় তাঁর ঘোড়ার গাড়ি উলটে যায়, তিনি প্রচন্ড আঘাত পান এবং সেই আঘাত তাঁর জীবনের পরবর্তী পঁচিশ বছর ধারাবাহিকভাবে যন্ত্রণায় কাতর করেছে। ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ এর দশক পর্যন্ত শহর কলকাতার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের দ্রুত পাল্টে যায়। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, পশুচালিত ট্রাম, বাষ্প চালিত যান, সাইকেল ইত্যাদি যানের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হলে শহরের পরিবেশের আমূল পরিবর্তন আসে।

(৫) জ্বরের কথা

> "প্রকান্ড প্রাসাদ উচ্চ জ্বর-হাস্পাতাল
> ছাদে উঠে ছোঁয়া যায় আকাশের গাল
> সুন্দর সোপান থাম ঘর-পরিকর
> নিশ্মার্ণ করেছে যেন ক্ষোদিত ভূধর।" (সুরধুনী কাব্য - দীনবন্ধু মিত্র)

সংবাদ প্রভাকর, ২১ মাঘ ১২৫৯, ইংরেজি ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩, সংবাদ অংশে লিখছে, " পটল ডাঙায় 'ফিবর হাসপাতালের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। নির্মাণকার্য শেষ হয় নাই। শেষ করিতে আরও কত টাকা লাগিবে বলা যায় না। সকলকে উক্ত অট্টালিকা দেখতে অনুরোধ করা হইয়াছে।"

কলকাতা বিশেষ করে 'নেটিভ কলকাতা' ছিল ম্যালেরিয়ার আঁতুড় ঘর। ম্যালেরিয়া দমনে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। আমজনতার অধিকাংশই ছিল গরীব কোনমতে একটা মাথাগোঁজার জায়গা পেলেই ভাবতেন ভগবান মুখ তুলে তাকিয়েছেন। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, বদ্ধ জলাশয়ের লালিত পালিত হৃষ্টপুষ্ট মশার অত্যাচার সব ভগবানের দান বলেই বিবেচিত হত। তুচ্ছ বলে মনে হত। মশার হাত থেকে বাঁচতে মশারি অনেক সময় বিলেসিতা হিসাবে বিবেচিত হত। উনিশ শতকের শুরু থেকে উত্তর কলকাতায়, কালো মানুষের কলোনিতে, প্রবল জ্বরে নাজেহাল হচ্ছিলেন স্থানীয় মানুষেরা। অথচ কলকাতার সাহেবপাড়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছিল উন্নতমানের। তখন মানুষের মনে কোন ক্ষোভ বিক্ষোভ নেই, থাকলেও তা প্রতিফলিত হয় নি সেইসময়ের পত্রপত্রিকা সাময়িকীতে। ম্যালেরিয়ার মশা তো নেটিভদের উপর তাদের সন্ত্রাস নামিয়ে এনেই ক্ষান্ত হবে এমন ভাবাটার মধ্যে মূখার্মি আছে। তারা সুযোগ পেলেই সাহেবপাড়ায় খাদ্যের সন্ধানে আক্রমণ শানিয়ে দিত। তাতেই বিপত্তি। মশাবাহিত জ্বরের চিকিৎসার জন্য ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশে এক কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৩ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে। সেই কমিটিতে ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রামকমল সেন, রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত। ম্যালেরিয়া যাতে না হয় সেজন্য ফিভার হাসপাতাল কমিটি যেগুলো সুপারিশ করেছিল তা বাস্তবায়িত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শহরের বর্জ্য নিয়মিত দূর করা, রাস্তা নির্মাণের সময় বাতাস চলাচলের প্রতিবন্ধকতা দূর করা, নিয়মিত পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি।

(৬) জনসংখ্যার বৃদ্ধির গল্প

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে, ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতা আগমনের প্রায় দেড় দশক আগে, জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক দশ হাজারের মতন। ১৮৪০ সাকে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন বার্চ এর মতে শহর কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ২২৯৭০৫ জন। সংবাদ প্রভাকর অনুসারে ১৮৫০ সালে শহর কলকাতার জনসংখ্যা / প্রজার সংখ্যা ছিল ৩৬১৩৬৯ জন। ১৮৭২ সালে কলকাতার জনসংখ্যা হয় ৪,৪৭,৬০১ জন। ১৮৯১ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর দশকে, প্রথম জনগণনা অনুসারে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ৬,৮১,৫৬০ জন। এই সংখ্যা শহরতলী বাদ দিয়েই। কলকাতা ছিল এক হদ্দ গ্রাম। অসংখ্য ছোট ছোট নালা কয়েক হাজার পুকুর নিয়ে ১৭৭৪ সালে কলকাতা ঘোষিত হয় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। হেস্টিংস হয়েছিলেন ব্রিটিশ ভারতের গর্ভনর জেনারেল। তখন শহরের কোন সীমানা সরকারি ভাবে নির্দিষ্ট ছিল না। ১৭৭৯ সালে সরকারি ভাবে প্রথম কলকাতা শহরের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের যখন ২৭ বছর অর্থাৎ ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত শহরের সীমা একই ছিল। মাত্র তিনটি গ্রাম কিনে নগর পত্তনের যুগে কলকাতার "আয়তন ছিল ৬.৩ বর্গ কিলোমিটার ... অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হয় ৫৩ বর্গ কিলোমিটার।"

ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতা আগমনের সময়ে কলকাতায় অধিকাংশ নালার (স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার জন্ম নেওয়া নালা বা ছোট খাল) দুইধারে অসংখ্য জেলে বস্তি ছিল। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় জেলে বস্তি। জমির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জন্ম নেওয়া নালা বা ছোট খাল কলকাতার মানচিত্র থেকে উধাও হয়ে যায়। ছোট্ট এক উদাহরণ ক্রিক রো নামক রাস্তাটি। একসময়ে এটা একটা খাল ছিল। গঙ্গা (ভাগীরথী) থেকে বেরিয়ে মধ্য কলকাতা হয়ে লবণ হ্রদে গিয়ে পড়ত। লবণ হ্রদ হয়ে তা মিশত ইছামতী নদীতে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে যে মারাঠাখাল খনন করা হয়েছিল তাও বুজিয়ে দেওয়া হয়। অসংখ্য পুকুরকে কসাইয়ের মতো হত্যা করা হয়। ফলে কলকাতার বাস্তুতন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতা হয়ত বাংলার মধ্যে সবথেকে দূষিত নগরীতে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা প্রধানত দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, নেটিভ এবং বিদেশী শাসকদের অঞ্চল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ এসে পড়েছিল নেটিভ কলকাতায়।

(৭) শেষকথা

কলকাতা পুরসভার সূচনা হয় ১৮৬৩ সালে (পৌর আইন - The Act VI of 1863)। ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এসেছিলেন ১৮২৮ সালের শেষের দিকে। ১৮৬৩ সাল অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর তিনি বলতে গেলে পৌরশাসন হীন শহরে বসবাস করতেন। পৌরসভা থাকলেই যে শহর কলকাতা লন্ডনের মতো হয়ে যাবে বা যেত এমন ভাবনার মধ্যে দৈন্যতা আছে। শহরের অন্যতম সমস্যা ছিল বিশুদ্ধ পানীয় জলের দূরীকরণের জন্য বাজার থেকে টাকা ধার করবার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং নাগরিকদের উপরে জলকর চাপিয়ে দেওয়া হয়। জলের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার তাকে পণ্যে পরিণত করা হয়। ১৮৭০ সাজে পলতা থেকে লোহার পাইপ করে এনে ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাট থেকে যে গঙ্গার জল সরবরাহ করা হত তা ছিল নোংরা এবং পানের অযোগ্য তা দিয়ে কিছু রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলকাতায় থেকে থেকেই কলেরা রোগের প্রার্দুভাব হত বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের বাবা কলেরা রোগে আকালে মারা যান। ঈশ্বরচন্দ্রের সহধর্মিণী দীনময়ী দেবী কলকাতাতে ১৮৮৮ সালের (ইং) ১৩ আগস্ট ৬২ বছর বয়সে পেটের রোগে (রক্তাতিসার রোগ) ভুগে মারা যান।

উনিশ শতকে কলকাতা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল, (পরিবেশ-সমাজ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি ইত্যাদি।) শতকের শুরুর দিকে ব্যবসায়ী, বণিক, নব্য জমিদার, দালাল শ্রেণীর মানুষের প্রাধান্য থাকলেও আস্তে আস্তে এক নতুন শ্রেণীর, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, জন্ম নিতে থাকে তারাই হয়ে ওঠেন সমাজের প্রতিনিধি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদের এক প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন আধুনিক এবং ঈশ্বর বিরোধী প্রকৃত এক মানুষ। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজদের সহযোগিতায় সমাজকে পালটে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি সমাজ পরিবর্তনের যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাতে পরিবেশ সচেতনতার বিষয় ছিল না । থাকার কথাও নয়। সেইসময় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি, মধ্যবিত্তদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় না তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয় ছিল। কিন্তু ব্যাতিক্রমী মানুষদের সুপরামর্শ রাষ্ট্র কোনোদিনই শোনে না। শুনতে চায় না।